প্লীজ সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলুন

শেখ হাসিনা

গত কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি ব্যাপকভাবে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন চলছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সবই বলা হচ্ছে ঢালাওভাবে। খুবই খুশি হতাম যদি ঢালাওভাবে না বলে ব্যক্তি, দল, দলের জন্মসূত্র, ক্ষমতা, ক্ষমতায় যাবার পূর্বে কার কি সম্পত্তি ছিল, পরে কত বৃদ্ধি হলো, কে কোন পেশা থেকে রাজনীতিতে এসেছে, ক্ষমতায় থাকতে কে কীভাবে দেশ চালিয়েছে, দেশের মানুষ কি পেয়েছে- ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হত তাহলে কোন কথা থাকত না। কিন্তু তা কিছুই করা হচ্ছে না।

তবে এটা নতুন কিছু নয়, যারা রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলে এবং রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তারাই আবার পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে অবতরণ করেন এবং রাজনীতিবিদ হয়ে যান।

আমার প্রশ্ন হলো- রাজনীতিবিদদের হেয় করার এ প্রবণতা কার স্বার্থে? এর একটা প্রশ্নও আছে সেটা হলো রাজনীতিবিদদের সংজ্ঞা কি? কাদের রাজনীতিবিদ বলবেন? কাদের বলবেন না? বড় বিচিত্র এ দেশ মাঝে মাঝেই আমার মনে প্রশ্ন আছে- আমি তো রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নিয়েছি। দেখেছি দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগ, জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করা। বাবার হাত ধরে যখন স্কুলে যাবার কথা তখন মায়ের হাত ধরে জেল গেটে যেতে হয়েছে বন্দী বাবাকে দেখতে। অনেক সময় পিতা জেলে বলে লেখাপড়া বন্ধ হয়েছে, স্কুল বন্ধ হয়েছে। আমাদের প্রজন্মের অনেককেই এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলো। এই আত্মত্যাগ যারা করেছেন তাদেরই অর্জন হলো স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কিন্তু সেই বাংলাদেশেই তো এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের হত্যা করা হয়েছে নির্মমভাবে। হত্যার পূর্বে পরিকল্পিতভাবে বদনাম ছড়ানো হয়েছে, মিথ্যা অপপ্রচার করা হয়েছে। মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। আর হত্যার অজুহাত নেয়া হয়েছে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, দুর্নাম রটিয়ে।

হত্যাকাণ্ডের মত চরম জঘন্য ঘটনাকে জায়েজ করার জন্য রাজনীতিবিদদের চরিত্র হনন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে উনিশটি ক্যু হয়েছে সামরিক বাহিনীতে। হাজার হাজার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কত মায়ের কোল খালি হয়েছে, কত বোন বিধবা হয়েছে। সন্তান পিতাহারা হয়েছে।

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে এবং ৩ নভেম্বর চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা তো বলেছিল অনেক দুর্নীতি হয়েছে, তাই এই ঘটনা ঘটেছে। একত্রিশ বছর হয়ে গেছে এ পর্যন্ত একটা দুর্নীতি বা কোন অনিয়ম হয়েছে তা কি প্রমাণ করতে পেরেছে? পারেনি। কিন্তু অপপ্রচার তো ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল। যারা এই মিথ্যাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধেও তো কোনও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কিন্তু রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে কথা বলে যারা ক্ষমতা দখল করেছিল অবৈধভাবে, তাদের ভূমিকা কি ছিল? জেনারেল জিয়া নিজেকে নিজেই প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিল অস্ত্রের জোরে আর উর্দি খুলে সাফারি স্যুট পরে রাজনীতিবিদ হয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল 'I shall make politics difficult for the politicians' এবং ঠিকই সে তা করেছে। আজকের অবস্থাটা যখন পর্যবেক্ষণ করি তখন যে কথাটা বারবার মনে হয় সত্যিই ত্যাগী, নিঃস্বার্থ, দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে গেছে। ইদানীং এমন এমন মানুষের কাছ থেকে সমালোচনা শুনতে হয় যাদের অতীত ইতিহাস, অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কিন্তু স্বচ্ছতা নেই, জবাবদিহিতা নেই। আর যখন বলেন, তখন তা ঢালাওভাবে বলেন।

সাদাকে সাদা বলেন না বা কালোকে কালো বলেন না। মনে হয়, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন। ধোঁয়াটে ভাব সৃষ্টির উদ্দেশেই বলেন।

আমার কথা স্পষ্ট। যখন কথা উঠেছে তখন কোন দলের জন্ম কীভাবে হলো, তাদের কার্যক্রম কি, ক্ষমতায় থেকে কোন দলের সময় কতজন কত সম্পদের মালিক হয়েছে তা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে অঙ্কের মত হিসাব দিয়ে বলতে হবে। শুধু তাই নয়, কোন সরকারের কাছ থেকে কে কতটুকু সুবিধা নিয়েছেন, কে কোন ব্যবসাটা নিয়েছেন যার বদৌলতে সমাজের বিশেষ স্থানে স্থান করে নিতে পেরেছেন তাও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করুন যদি সৎ সাহস থাকে।

রাজনীতি, সৎ ও যোগ্য প্রার্থী, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, কালো টাকার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুরো আজ আলোচনায় উঠে এসেছে দেখে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত। এর পেছনে একটা কারণও আছে। যে কথাটা আজ একত্রিশ বছর পর সকলে উপলব্ধি করলেন সে কথাটা কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে জাতির জনক উপলব্ধি করেছিলেন। আর সে কারণেই সাময়িকভাবে একটা পরিবর্তনও এনেছিলেন। কিন্তু তখন তা কেউই দূরদর্শিতার অভাবে বুঝতে পারেনি। অথবা হতে পারে স্বাধীনতাকে অর্থহীন করার জন্য কোনও ষড়যন্ত্র এর পেছনে ছিল তাই তা কার্যকর করতে দেয়নি।

নির্বাচনে যাতে কালো টাকা ও সন্ত্রাসীরা প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্য নির্বাচন পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তাহলো, প্রার্থী যারা হবে তাদের পোস্টার সরকার করে দেবে। নির্বাচনের সব খরচ জাতীয় সরকার বহন করবে। প্রার্থী শুধু বাড়ী বাড়ী যেতে পারবে। সভা-সমাবেশ এক সাথে করতে পারবে। একই মঞ্চে দাঁড়াবে। এজন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে নিরপেক্ষভাবে। এভাবে দুটো উপনির্বাচন হয়। কিশোরগঞ্জে উপনির্বাচনে একজন স্কুল শিক্ষক জয়ী হন। ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাই হেরে যান। ক্ষমতায় ছিলেন বলে ভাইকে জেতাতে কারচুপিও করেননি, ক্ষমতার প্রভাবও খাটাননি।

জাতীয় সংসদে বিল এনে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করা হয় এবং জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। সেখানে সংসদ সদস্য যারা হতে পারেননি সেই সকল দল প্রশাসন, সেনাবাহিনীসহ সকল শ্রেণী-পেশাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব দেয়া হয়েছিল। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা। আর এর শুভফল দেশের মানুষ পেতে শুরু করেছিল।

আমি এ পরিবর্তনের পর আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেন পরিবর্তন করলেন, আমি যে উত্তরটা পেয়েছিলাম তাই এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেছিলেন, "আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছি, বিপ্লব করেছি, গেরিলা যুদ্ধ করেছি, বিজয় অর্জন করেছি। যে কোনও বিপ্লবের পর সমাজে একটা বিবর্তন আসে। হঠাৎ করে অনেকের হাতে অর্থ এসে যায়। গেরিলা যুদ্ধ করার কারণে যেখানে-সেখানে অস্ত্র ছড়িয়ে থাকে। নির্বাচনে অর্থ ও অস্ত্রের প্রভাব যাতে না থাকে, তৃণমূল থেকে সত্যিকার ত্যাগী দেশপ্রেমিক প্রার্থী যাতে জয়ী হতে পারে তার জন্য এই পরিবর্তন। একটা নির্বাচন হলে, এ থেকে এই সৎ মানুষগুলো নির্বাচিত হয়ে আসলে আর কোনও অসুবিধা হবে না, আমরা আবার সংবিধান পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতিতে চলে যেতে পারবো। এখন মনে হয়, একত্রিশ বছর আগে যে কথাটা তিনি বলেছিলেন আর সত্যিই যদি সেই পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের একটা নির্বাচন হতো তাহলে আজকের বাংলাদেশের এ অবস্থা হতো না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা সব পাল্টে দেয়।

সংবিধান স্থগিত করে গণতন্ত্র হত্যা করা হয় মার্শাল ল' জারি করে, মৌলিক অধিকার হরণ করে। বাংলাদেশের জনগণের জন্য দুর্ভাগ্য। নির্বাচন হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, কিন্তু কি সে নির্বাচন? অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর উর্দি খোলার জন্য এবং ক্ষমতা বৈধ করার জন্য কারচুপির মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ সীট দখলের নির্বাচন।

জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না। ভোট দেয়ার অধিকারও ছিল না। কারণ ফলাফল তৈরীই ছিল। আমি ১৯৭৮ সালের রেফারেন্ডাম বা হ্যাঁ-না ভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের কথাই বলছি।

সেই যে বাংলাদেশের জনগণ ভোটের অধিকার হারাল আজও ঘুরেফিরে সেই ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে। একবার একটু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায় তো আবার সেই দম বন্ধ পরিবেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়, ১৯৭৩ সালে সেই সংবিধানের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। ১৯৭৫ সালে হত্যা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন আর হয়নি কেবল ২০০১ সাল ছাড়া।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পাঁচ বছর সফলতার সঙ্গে দেশ চালায়। এই পাঁচ বছর বাংলাদেশের জনগণের জন্য ছিল স্বর্ণযুগ। শত বাধা, ষড়যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল। একটি সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেমন কম ছিল, তেমন আয়ও বৃদ্ধি হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। এর কারণ হল আওয়ামী লীগ কখনওই যেনতেনভাবে ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়নি। জনগণের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে। জনগণের কল্যাণেই রাজনীতি করে আর তাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশের সাধারণ মানুষ কিছু পায়। স্বাধীনতার ৩৬ বছরে আওয়ামী লীগ তো মাত্র সাড়ে নয় বছর ক্ষমতায় ছিল। স্বাধীনতা, সংবিধান, যা কিছু পেয়েছে এই দলটিই দিয়েছে। দু'বেলা ভাত থেকে শুরু করে সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন বা সস্তায় কম্পিউটার তাও আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য করেছে।

আওয়ামী লীগ নিঃস্বার্থভাবে সেবক হিসেবে কাজ করেছে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল।

তাই আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়া, এরশাদ, খালেদা সকলেই নানাভাবে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেও এ দলটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। শত অপপ্রচার করেও জনগণের হৃদয়ে আওয়ামী লীগের যে স্থান তা সরাতে পারেনি। এখনও জনগণের মনে আস্থা-বিশ্বাসেরস্থানটা এই দলটিরই আছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বারবার কুয়াশা সৃষ্টি করেছে আবার তা কেটে গেছে। কত মিথ্যে কথা প্রচার করা হয়েছে যা এখনও চলছে।

যারা দুই দল, বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে এক পাল্লায় ফেলেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন- এই দু'দলের জন্মসূত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি কার্যক্রম কি পরিষ্কারভাবে বলবেন? আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে ভাষা আন্দোলন ও জনগণের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে জন্মগ্রহণ করে। এই দল ক্ষমতাসীনদের দ্বারা উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে গঠিত দল নয়। বরং ক্ষমতাসীনদের অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে আওয়ামী লীগের জন্ম।

বিএনপির জন্ম অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী উচ্চাভিলাষী এক সামরিক কর্মকর্তার হাতে। স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে, সরকারী অর্থ ব্যয় করে এই দল গঠন করেছিল- দল করতে যারা এসেছিল তারা ত্যাগের মনোভাব নিয়ে আসেনি বরং ক্ষমতা ভোগের জন্যই এসেছিল। যার কারণে দুর্নীতি ও ঋণখেলাপী কালচার আর বিএনপির জন্ম যেন একইসূত্রে গাঁথা।

যারা ক্ষমতা দখল করে ভোগের জন্য তারা নিতেই জানে, দিতে জানে না। তাই জনগণ পায় না কিছু, শুধু কষ্টই পায়। আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয় কিছু লোকের। ভাগ্য গড়ে কিছু মানুষ। এ ক্ষমতায় বসে দল করার নেতিবাচক ফল হল মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র, ড্রাগ, কালো টাকা দিয়ে ছাত্রসমাজের চরিত্র হনন।

ফলাফল হচ্ছে যুবসমাজকে অসামাজিক কাজে যুক্ত করা, নীতিহীন-আদর্শহীন ভোগ-বিলাসের জীবনে অভ্যস্ত করে দিয়ে সমাজকে কলুষিত করা।

এসব কারণে বাংলাদেশ সামনে এগুতে পারেনি। বারবার হোঁচট খেয়েছে। বারবার অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল হয়েছে আর মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে, রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র উদ্ধার হয়েছে আবার ক্ষমতার লোভ তা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে।

২০০৬ সালে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে যে আন্দোলন করেছি এবং নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলাম তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল কেবল বিএনপি-জামায়াত জোট ছাড়া।

যেসব দাবী-দাওয়া নিয়ে আমরা গণআন্দোলন করেছিলাম তার যৌক্তিকতা আন্দোলনের সফলতার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দাবী-দাওয়ার বাস্তবায়ন করার কথা বলে আবার আমাদেরই নেতাদের অহেতুক সমালোচনা করা, জনগণের কাছে হেয় করা কেন? সমস্যাগুলো তো আগে থেকেই ছিল। আজ যারা এত সমালোচনা করে সবাইকে এক পাল্লায় ফেলছেন তারা তো এই সমস্যার বিষয়গুলো বা সংস্কারের বিষয়ে কথা বলেননি। বরং অনেকে অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু দায়িত্বে থাকতে সমস্যাগুলো সমাধানের কোনও উৎসাহ দেখাননি। ২০০১ সালের নির্বাচনটা যদি সত্যিকারভাবে নিরপেক্ষ হত তাহলে আজ আর এই সমস্যা সৃষ্টি হত না, মানুষের এই ভোগান্তি

হত না। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না। এই ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এমন এক দানব বসিয়ে দিলেন ক্ষমতায় যে, বাংলাদেশকে তারা একেবারে ফোকলা করে দিল। আর ওই দানবদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করা কি সমীচীন? অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম ও মহাজোটের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অগণিত নেতাকর্মীর সফল আন্দোলনের ফসল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আমাদের দাবী-দাওয়া ও আন্দোলনে জনসমর্থন ছিল বিপুলভাবে। ২০০১ সালেই কেবল আওয়ামী লীগ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। এছাড়া আর কখনও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি। এই আন্দোলনে ৬৮ জন নেতাকর্মী শাহাদাতবরণ করেছে। পুলিশের সাথে সাথে বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাসী ক্যাডাররাও আক্রমণ করেছে। ঢাকা শহরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে জামায়াত ক্যাডার এসে আক্রমণ করেছে। বলেছে, 'বৃষ্টির মত গুলী কর, মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী', গুলী করে তারা যুবলীগ নেতাকে হত্যা করেছে। তারপরও মানুষ সাহস হারায়নি। সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন তখনই সফল হয় যখন সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে তাকে গণআন্দোলনে পরিণত করে।

যে দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছি তার যৌক্তিকতাও প্রমাণিত হয়েছে। এত ত্যাগ-তিতীক্ষার ফসল বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। একজন উপদেষ্টা একটা উক্তি করেছেন, 'ব্যবসায়ীদের ধরা যাবে না, অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে।' তাহলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কিভাবে? ঃ এরপর কি বলবেন, শুধু রাজনীতিবিদরাই দায়ী হবে? এটা কিসের আলামত? স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে যে, একটা দলে তো সকল পেশার প্রতিনিধি থাকে। তাদেরকে কি হিসেবে দেখবেন। যদি এদের কেউ দুর্নীতি করে তাহলে কি হিসেবে গণ্য হবে যে যে পেশা থেকে এসেছে সেই পেশার ব্যক্তি হিসেবে না শুধু রাজনীতিবিদ হিসেবে? ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়া যাবে না কারণ অর্থনীতি অচল হয়ে যাবে- একজন উপদেষ্টার উক্তি। প্রশ্ন উঠতে পারে-

- প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। কারণ প্রশাসন অচল হয়ে যাবে।
- দুর্নীতিবাজ জজ ও আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না- কোর্ট-কাচারি বন্ধ হয়ে যাবে।
- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না- অচল হয়ে যাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত- এনজিওদের ধরা যাবে না, কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।
- ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না- হাসপাতাল ও ক্লিনিক অচল হয়ে যাবে।
- শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে যাবে।
- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না- সংবাদপত্র অচল হয়ে যাবে।

এভাবে যদি এক একটা কথা উঠে তাহলে রাজনীতিবিদরাই শুধু অপরাধী। তাদের বিরুদ্ধেই কেবল ব্যবস্থা নেয়া হবে? তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন ঠে- পূর্বে যাদের কথা বললাম তাদের মধ্য থেকেই তো আবার অনেকে রাজনীতিবিদ হয়। এরা সংগঠন করে, সংসদ সদস্য হয়, মন্ত্রী হয় আবার দুর্নীতিও করে। এদেরকে কি হিসেবে দেখবেন? আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এনজিও নেতা ইত্যাদি কি হিসেবে চিহ্নিত হবে? কোন রাজনীতিবিদ তা হলে অপরাধী? যারা জনগণের দাবী-দাওয়া নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন করবে, পুলিশের বাড়ি, গুলী, টিয়ার গ্যাস, বোমা, গ্রেনেড, হামলা, জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করবে, ছেলে-মেয়ে- স্ত্রীকে সময় দেবে না, আর্থিক সচ্ছলতা দেবে না, সারাজীবন ত্যাগ স্বীকার করে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

ক্ষমতায় বসাবে আর বসেই ওই মাঠের মানুষদের উপর খড়গ হস্ত হবে আর নীতিকথা শোনাবে। এটা তো প্রতারণার শামিল।

অপরদিকে যারা নিজের জীবনকে আগে প্রতিষ্ঠিত করবে, গায়ে ধুলা-ময়লা লাগতে দেবে না। কোনদিন লাঠির আঘাত তো দূরের কথা, এতটুকু রোদের তাপও গায়ে লাগাবে না, আর্থিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে সমাজে নিজেরস্থানটি করে তারপর রাজনীতিতে নেতা হতে নামবে শুধু ক্ষমতার ভোগদখল করার জন্য। এই শ্রেণীর রাজনীতিবিদের আওয়াজটা বড় উঁচু হয়। কারণ তারা তো আখের গুছিয়ে নামেন। তরতাজা থাকেন। পোড় খাওয়া নয়। আর এদের দিয়ে দেশের কতটা ভাল হতে পারে? স্বাধীনতার ছত্রিশ বছরের মধ্যে সাড়ে পঁচিশ বছর তো এই শ্রেণীর হঠাৎ গজিয়ে উঠা রাজনীতিবিদরাই দেশ চালিয়েছে- কি দিয়েছে দেশকে আর নিজেরা কি নিয়েছে দেশ থেকে। আসুন না তার একটা হিসাব হয়ে যাক। তাহলেই তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদের জন্য রাজনীতি করা কঠিন করে দেয়া হচ্ছে। আর এ কারণে সুবিধাবাদী, তোষামোদী, খোসামোদিদের প্রাধান্য বাড়ছে। ত্যাগ নয়, ভোগের মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিতে অবতরণ করেই জনগণকে শোষণ করা হচ্ছে। যে কারণে স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরও দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ধনী থেকে আরো ধনী হয়েছে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। যদি আদর্শবাদী রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকতে পারত তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারত।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা যদি না ঘটত আর বঙ্গবন্ধু যদি পাঁচটা বছর হাতে সময় পেতেন তাহলে বাংলাদেশ পৃথিবীর জন্য উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেই এ তথ্য পাওয়া যায়।

অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনৈতিক নেতা হওয়ার ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে দেশের ও দেশের মানুষের ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটেছে বারবার।

শুধু দুর্নীতি-লুটপাটই হয়নি, ভয়াবহ ভেজাল এদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছে। একটা জাতি যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয় তা হলে এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে।

বিদেশে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অখাদ্য হিসেবে নষ্ট করে ফেলার জন্য চিহ্নিত করা হয় সেগুলোই আমদানী করে আমাদের দেশের মানুষকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মানুষের সর্বনাশ করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছর যে কি ভয়ঙ্করভাবে জনগণের সর্বনাশ করে কিছু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অগাধ টাকার মালিক হয়েছে তা দেখে আঁৎকে উঠতে হয়।

একটি ঘটনা পত্রিকায় দেখলাম। ইদানীং ধরা পড়েছে ত্রাণভাণ্ডারের টিন ও কম্বলসহ শীতবস্ত্র। বিএনপির নেতাদের কাছ থেকে এসব উদ্ধার করা হয়। এরা এত বেপরোয়া হয়ে দুর্নীতি করতে সাহস পেয়েছে তার কারণ কি? কেউ যখন এদের গালি দিচ্ছে তখন রাজনীতিবিদ হিসেবে দিচ্ছে আর তার কারণে যারা দেশপ্রেমী, ত্যাগী মনোভাব নিয়ে রাজনীতি করে তাদেরও গালি খেতে হচ্ছে। এটাতো করলে চলবে না- ত্রাণভাণ্ডারের টিন যে কারখানায় ব্যবহার করা হয়েছে এবং কম্বল পাওয়া গেছে তার পার্টনার কিন্তু মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানেরই পরিবারের সদস্য। যিনি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন আর তার পরিবার এখনও সেনানিবাসে বসবাস করে। আর এ কারণেই কিন্তু এত বেপরোয়া হতে পেরেছে। জবরদখল করে ক্ষমতা পাওয়া গজিয়ে ঠা রাজনীতিবিদ বলেই চুরি করার সাহস পাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য গালি খেতে হয় রাজনীতিবিদদের। এরা কি রাজনীতিবিদ? শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হওয়ার কারণে নামে-বেনামে তারেক ও কোকো কিভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়? ভাই, বোন, বোনের ছেলে-মেয়ে হওয়ার সুবাদে পাঁচ বছরেই দেশে-বিদেশে বাড়ীগাড়ীসহ বিশাল সম্পদের মালিক হয়েছে। কিভাবে সম্ভব পাঁচ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া? ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে ভাঙ্গা সুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জির মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল তার ভেতরে এমন কি আলাদিনের চেরাগ ছিল? আমার কল্পনাতেও আসে না, রাতারাতি ১৬টি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক এরা কিভাবে হয়ে যায়? বিদেশে টাকা পাচার, সফরের সময় শতাধিক স্যুটকেস এবং বেনামেও যে কত সম্পত্তি করেছে কে জানে? শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রিয়ভাজন ও কাছের মানুষ হওয়ার কারণে ফুট-ফরমাশ খাটা কেউ একজন হুট করেই দেশের মিডিয়া টাইকুন হয়ে যায় এই গ্রহে, শুধুমাত্র বাংলাদেশেই গত ৫ বছরে সম্ভব হয়েছে।

যারা একদিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রিলিফ চুরির অপবাদ দিতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিলেন তারা কি এখনো প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডারের রিলিফ চুরির দোষ সব রাজনীতিবিদদের উপর চাপাবেন? নাকি দয়া করে বলবেন যে, জাত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে। চোরের নজর গাঁটের দিকে বলেই এত হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়ার পরও এরা রিলিফের টিন, কম্বল, শাড়ী-লুঙ্গির লোভ ছাড়তে পারে না।

দুর্ভাগ্য হলেও সত্য (১৯৯৬-২০০১) যে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে যেটুকু এগিয়ে নিয়েছিলাম দেশকে, পরবর্তী পাঁচ বছরের (২০০১-২০০৬) দুর্নীতি, সন্ত্রাস, লুটপাট পূর্বের অগ্রযাত্রা শুধু থামিয়েই দেয়নি বরং পেছনে টেনে নিয়েছে। আর ঢালাওভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে অর্জনটুকুও হারিয়ে গেছে। অন্যের অপরাধের বোঝার দায়ভাগ আমরা কেন বহন করব? সত্য কথা বলার সৎ সাহস কি কেউ দেখাতে পারবে না? ২০০১ থেকে ২০০৬ আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতার বাইরে ছিল, যদি কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে, যদি তেমন কোনও দোষ পেত তাহলে কি বিএনপি সরকার ছেড়ে দিত? তন্ন তন্ন করে তো তারা খুঁজেছে। জেল দিয়েছে, নির্যাতন করেছে এতটুকু ছাড়তো দেয়নি। দেশে-বিদেশেও তদন্ত করেছে। কি পেয়েছে? পেলে কি ছেড়ে দিত। শেষ পর্যন্ত গ্রেনেড মেরেও হত্যার চেষ্টা করেছে। সংসদ সদস্যসহ ২৬ হাজার মানুষ হত্যা করেছে কিন্তু তার কোনও বিচার হয়নি, তদন্ত হয়নি। আর কত পরীক্ষা দিতে হবে? তেলা মাথায় তেল না দিয়ে গরীবের পক্ষে কথা বলা, কাজ করাই বোধহয় আওয়ামী লীগের অপরাধ। চোরদের সাথে দয়া করে কেউ তুলনা করবেন না, খুবই কষ্ট হয়। মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে চাই না। সততা ও জনগণের উপর বিশ্বাসই আমার রাজনীতির একমাত্র ভরসা। আমি সব সময় বিশ্বাস করি আল্লাহ পরীক্ষা নেন এবং সৎ মানুষের সাথে থাকেন। তাই আমরা জোর করে বলতে পারি সত্যের জয় হবেই। ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। দুই নেত্রী। সব সমস্যা নাকি দুই নেত্রীকে নিয়ে। আবার আরও কথা হয় পরিবারতন্ত্র।

আইনজীবীর সন্তান যদি আইনজীবী হয় তাহলে কি তা পরিবারতন্ত্র হবে? তা যদি না হয় তাহলে রাজনীতির ক্ষেত্রে কথা উঠবে কেন? দুই নেত্রী নিয়ে কথা হয় এবং এক শ্রেণী তো রাজনীতির সব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন দুই নেত্রীর কারণে? এখানে যদি দুই পুরুষ দুই দলের নেতা হত তা হলে কি প্রশ্ন দেখা দিত? এটা কি পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ নেতৃত্ব পাচ্ছে না বলে কোন গ্লানি অনুভব করছে? আর সেই ব্যর্থতা ঢাকার প্রয়াস? জনগণ যাকে গ্রহণ করবে সেইতো নেতা হবে। কেউ যখন তুলনা করেন দুই নেত্রী বলে তাদের অনুরোধ করব পুরোপুরি তুলনা করুন না কেন? শিক্ষা-দীক্ষা, চালচলন, সাজ-পোশাক, দল পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি সব বিষয়ে একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরুন।

পাঁচ বছরে খাদ্য উৎপাদন ১ কোটি ৯০ লাখ মেঃ টন থেকে ২ কোটি ৭০ লাখ মেঃ টনে বৃদ্ধি করেছিলাম।

যা আগের তুলনায় ৮০ লাখ মেঃ টন বেশী। তেমনি বিদ্যুৎ ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াটে (ক্যাপটিভ জেনারেটরসহ) উন্নীত করি। শিক্ষার হার ৪৬% থেকে বেড়ে ৬৬%-এ উন্নীত হয়।

প্রবৃদ্ধি ৬.৬% হয়। মূল্যস্ফীতি ৬.৪ থেকে কমিয়ে ১.৫৯ ভাগে নামিয়ে আনা হয়েছিল। দারিদ্র্য বিমোচন ১.৫২ হারে করা হয়েছে, যা বর্তমানে .৪৮ হারে নেমে এসেছে অর্থাৎ দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, চিহ্নিত কয়েকজনের মধ্যে পয়সা ভাগাভাগি হচ্ছে। চাল, ডাল, তেল, লবণ ও সার বিতরণে কোন অনিয়ম ছিল না। জিনিসের দাম পাঁচ বছর স্থিতিশীল রেখেছিলাম- যদি দুর্নীতি করতাম তাহলে কি এটা সম্ভব হত? হত না। বেসরকারী খাতে টেলিভিশন-রেডিও, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মোবাইল ফোন, বিমান ছেড়ে দিয়েছিলাম। ১৯৯৮ সালের তিন মাসব্যাপী ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলা, ত্রাণ বিতরণ, কোনও ক্ষেত্রে কেউ দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি।

এক পাল্লায় ফেলার আগে এ বিষয়গুলো নিয়ে সত্য বলবেন এটা আশা করি। বিমান বাহিনীর জন্য আটখানা মিগ-২৯ বিমান, ১১৯ মি. মা. ডলার দিয়ে কিনেছি টেন্ডারে দাম উঠেছিল ২৮৯ মি. মা. ডলার। ১৭০ মি. মা. ডলার বাঁচিয়েছি। তেমনি ফ্রিগেড ১০৪ মি. মা. ডলার থেকে কমিয়ে ৯৯ মার্কিন ডলার দিয়ে কিনে দেশের টাকা বাঁচিয়েছি- কমিশন খাওয়ার রাজনীতি করিনি দয়া করে দুই জনকে এক পাল্লায় ফেলে একজনের সফলতাকে ান করা আর অপরজনের ব্যর্থতাকে ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলাম রাষ্ট্রপরিচালনায় সফলতাই বেশী দেখাতে পেরেছি।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও কৃষি, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি যা যা আজ জনগণ হাতে পাচ্ছে বা ভোগ করছে তা ১৯৯৬-২০০১ সালের শাসনকালেই পেয়েছে। তা হলে ব্যর্থতা কোথায়? ২০০১-২০০৬ সালে কি পেয়েছেন তুলনামূলক হিসাবটা বের করুন। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি, কালো টাকা, দখল, ভেজাল, নকল, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, বোমা, গ্রেনেড, নারী ধর্ষণ, গণপিটুনি, ক্রসফায়ার- লাশ, অনিশ্চয়তা, উদ্বিগ্ন ছাড়া আর কি মানুষ পেয়েছে? আত্মীয়-স্বজন নিয়েও কথা উঠে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। ছাত্রজীবন থেকে যে যেখানে পড়াশোনা করেছে

রাজনীতির সঙ্গেও তারা জড়িত ছিল। আমাদের গ্রাম টুঙ্গীপাড়া, পাটগাতি ইউনিয়ন ছিল। গোপালগঞ্জ মহকুমা, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। আমার আব্বার দাদা (আমার দাদার চাচাতো ভাই) শেখ আবদুর রশীদ এবং তার ছেলে খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ব্রিটিশ আমল থেকেই। খান সাহেব উপাধিও পেয়েছিলেন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের জন্য। খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন ১৯৬৫ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে ভারত চলে যান। ১৯৭১ সালে তার বাড়ীঘর পাকিস্তানী সেনারা পুড়িয়ে দেয়। ঢাকায় কোনও বাড়ী নেই। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নেননি তিনি, ইন্ডাস্ট্রির মালিকও হননি।

আমার বড় ফুফুর বিয়ে হয় দত্তপাড়া, শিবচর, মাদারীপুর। তার দেবর বাদশা মিয়া সংসদ সদস্য ছিলেন ১৯৪৬ সালে। তার ছেলে ইলিয়াস আহম্মদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং ভাল ক্রীড়াবিদও ছিলেন।

১৯৭০, ১৯৭৩ ও ১৯৯১ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ছেলে লিটন চৌধুরী ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। ছয় বার সংসদ সদস্যের এই পরিবার এখন পর্যন্ত ঢাকায় ভাড়া বাড়ীতে থাকে, কোনও বাড়ী নেই। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুজিব বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। খুলনায় ব্যবসা ছিল। তার বার্জ ও কারগো পাকিস্তানী হানাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঢাকায় ফিরে ইচ্ছে করলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি কিনে নিতে পারতেন, নেননি। ঢাকায় বাড়ীও নেই। দত্তপাড়া তাদের গ্রামের বাড়ী ১৯৭১ সালে পুড়িয়ে দেয়া হয়।

আমার মেজ ফুফু টুঙ্গিপাড়ায় বিয়ে হয়। শেখ ফজলুল হক মণির মা। ফুফাজান সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন।

ব্রিটিশ আমলে আমাদের এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বিএ পাস করেন। ১৯৭১ সালে তার বাড়ীও পুড়িয়ে দেয় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। শেখ মণি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। ১৫ আগস্ট তাকে ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে গুলী করে হত্যা করা হয়। তার এতিম দুই শিশুপুত্র রেখে যান। তারা বড় হয়ে বিয়ে করেছে। ঢাকায় কোন বাড়ী শেখ মণি করে যাননি বা পরিত্যক্ত বাড়ীও কিনেননি। ছেলেরা এখনও ভাড়া বাসায় থাকে।

আমার সেজ ফুফু বরিশাল বাড়ী। ফুফা আবদুর রব সেরনিয়াবাত আইনজীবী ছিলেন। ১৯৭০ ও ’৭৩ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। তার ছেলে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা, বরিশালে পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ১৯৯১, ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য। ১৯৭১ সালে বরিশালের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হয়। ঢাকায় কোনও পরিত্যক্ত বাড়ী কিনেননি। চারবার সংসদ সদস্য পদ এই পরিবার পেয়েছে।

রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি করার জন্য যে জাতীয় কমিটি করা হয়েছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ হিসেবে। কলাবাগানে একটা বাড়ীতে থাকেন। গুলশান বারিধারা অভিজাত এলাকায় স্থান করে নিতে পারেননি। ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার মেয়ে বেবী, আরজু, ছেলে আরিফ, ভাইয়ের ছেলে শহিদ ও রিন্টুকে হত্যা করা হয়। হাসানাতের ছেলে সুকান্ত চার বছর বয়স তাকেও গুলী করে হত্যা করা হয়। আমার ফুফু, তার ছেলেমেয়েরা খোকন, বিউটি ও রীনা এবং হাসানাতের বউ সাহানা গুলীবিদ্ধ হয় মিন্টু রোডের বাসায়।

আমার ছোট ফুফু গোপালগঞ্জের মুকসেদপুর বিয়ে হয়। ফুফা সাইদ হোসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে মাস্টার্স পাস করে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। যেহেতু আমার আব্বা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করতেন সে কারণে তিনি চাকরিতে প্রমোশন পেতেন না। তাছাড়া তাকে হয়রানিমূলক বদলি করা হত।

মাগুরা-হবিগঞ্জ-ঠাকুরগাঁও-রামগড়-রংপুর-সিলেট-ময়মনসিংহ-রাঙ্গামাটি- বলতে গেলে আমার ফুফাতো ভাইবোনেরা এক স্কুলে পড়ত তো অন্য স্কুলে গিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হত। এভাবে কোথাও দশ মাস, কোথাও ছ’মাস এভাবেই হয়রানির শিকার হয়েছে। তার ছোট মেয়ে রোজীকে ১৯৭৫ সালে গুলী করে হত্যা করা হয়।

আমার ফুফুকে তিনমাস গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ফুফা দু’বছর কারাগারে বন্দী থাকেন। আমার আব্বার একমাত্র ভাই শেখ নাসের। খুলনায় ব্যবসা করতেন, সক্রিয় রাজনীতি করতেন না। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

একটা পা পঙ্গু ছিল তার- এ অবস্থায়ও গানবোটে করে সুন্দরবন এলাকায় মেজর জলিলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেন। শেখ জামালও একই সেক্টরে যুদ্ধ করে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও ঢাকায় কোনও পরিত্যক্ত বাড়ী ক্রয় করেননি বা কোনও ইন্ডাস্ট্রির মালিক হননি।

আমার ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও লেঃ শেখ জামাল দু'জনই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিল। কামাল কর্নেল ওসমানীর এডিসি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে- ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার পর যখন ওসমানী সেনাপতির দায়িত্ব নেন তখন। দেশে ফিরে আসার পর ইচ্ছা করলে বাড়ী, ইন্ডাস্ট্রিসহ বহু কিছুরই মালিক হতে পারত কামাল ও জামাল। তারা কিন্তু তা করেনি। কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পড়াশোনা শুরু করে।

জামাল ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করে। যুগোশ্লাভিয়ার পেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ঢাকা সফরে আসেন, তিনি জামালকে যুগোশ্লাভিয়া থেকে পড়াশোনা ও ট্রেনিং দেবেন বলে দাওয়াত দিলে জামাল সেখানে যায়। কিন্তু ভাষার অসুবিধার কারণে প্রেসিডেন্ট টিটোর পরামর্শে ইংল্যান্ডে সেন্ডহার্স মিলিটারী একাডেমীতে ভর্তি হয় সে।

ভর্তির আগে জামাল নিজের খরচ চালানোর জন্য লন্ডনে সেলফরীজ দোকানে সেলসম্যানের চাকরি নেয়।

পিতা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছেলে তখন সেলসম্যানের চাকরি করত নিজের পড়ার খরচ যোগাড় করতে। আমাদের বিবেকবানরা কি দয়া করে এটা তুলনা করবেন বর্তমানের সঙ্গে? পড়া শেষ করে বাংলাদেশে আসে এবং বাংলাদেশ আর্মিতে যোগদান করে সে। ছ'মাসের একটা ট্রেনিং-এ যাওয়ার কথা ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কামালকে তার স্ত্রী সুলতানাসহ এবং জামাল ও তার স্ত্রী পারভীনকে হত্যা করে ধানমন্ডি ৩২নং বঙ্গবন্ধু ভবনে।

প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্সের ছেলে হিসেবে কোনও ইন্ডাস্ট্রি বা বাড়ী কিছুই কিন্তু করেনি। শেখ কামাল আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছে। সম্পদ বলতে রেখে গেছে তার সেতার আর ক্রিকেটের ব্যাট।

আমার স্বামী আণবিক কমিশনে চাকরি করতেন। সীমিত আয়ের মধ্যদিয়ে চলতে হত। প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে হিসেবে কয়েকটি বাড়ী, শিল্প কলকারখানাসহ অনেক কিছুরই মালিক হতে পারতাম যদি ইচ্ছা করতাম। সে ইচ্ছা কখনও করিনি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি- মনটা তাতেই ভরে ছিল। বরং আমাদের চেয়েও কষ্টে কারা আছে তাদের কিভাবে সাহায্য করব সেই চিন্তাই ছিল। কখনও নিজে সম্পদের মালিক হব এই লোভ-লালসা আমাদের গ্রাস করেনি, একটা নীতি-আদর্শ নিয়ে আমরা বড় হয়েছি।

বাবা-মা আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন। আমার আব্বা বলতেন, সবসময় নিচের দিকে তাকিয়ে চলবে।

তোমার থেকে কে বেশী কষ্টে আছে তাই দেখবে তাহলেই বুঝবে তুমি কেমন আছ? আমি পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। আমার ছেলে-মেয়ে, শেখ রেহানা, তার ছেলে-মেয়েরা সকলকেই এই নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দিয়েছি। তাই প্রধানমন্ত্রীর বোন, এখনও লন্ডনে বাসে চড়ে অফিস করে। চাকরি করে খায়।

একখানা গাড়ীও কিনতে পারেনি। জয়, পুতুল, ববি, টিউলিপ চার ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখেছে, মানুষ হয়েছে। চাকরি-বাকরি করে খাচ্ছে। ওদের লোভ-লালসায় পেয়ে বসেনি। অন্তত সন্তানদের নিয়ে কোনও বদনাম শুনতে হয় না। মানুষের মত মানুষ হয়েছে। আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শোকরানা আদায় করি।

আর দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই।

এবার তুলনা করুন বিএনপি-জামায়াতের এমপি-মন্ত্রী ও তাদের সন্তানদের ক্ষমতায় থাকার আগে কি সম্পদ ছিল আর এখন ক'টা সম্পদের মালিক। রাতারাতি ২০-২৫টি শিল্প কারখানার মালিক, হাজার হাজার একর জমি স্বনামে-বেনামে। পত্রিকার মালিক, প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের মালিক, কোন সৎপথের কামাই থেকে করেছে? প্রাইভেট টিভি-রেডিও চ্যানেল আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই দেয়া হয়েছিল কিন্তু কোনও মন্ত্রীএমপিরা মালিক হতে পারেনি। আমাদের পরিবারের কেউ তা করতে পারেনি কারণ টাকা ছিল না। জিয়া পরিবারই ২/৩টা চ্যানেলের মালিক হয়ে গেছে। একবার ক্ষমতায় গিয়েই এত সম্পদ বানিয়েছে যা শুনলে মাথা ঘুরে যায়।

আমার আব্বা ১৯৫৪ সালে মন্ত্রী ছিলেন। আমরা ৩ নম্বর মিন্টু রোডে থাকতাম। ১৯৫৬ সালে আবার মন্ত্রী হন। ১৫নং আব্দুল মতিন রোডে বাসা ছিল। এরপর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ভাগ্য গড়ার চিন্তাও আমরা কখনও করিনি। তাই আমাদের সম্পর্কে অনেক অপপ্রচারও করা হয়েছে। এখনও সে প্রক্রিয়া চলছে। ১৯৭৫ সালে যখন পরিবারের সকলকে হত্যা করা হল তখন তো রেডিওটেলিভিশনে বারবার প্রচার করা হয়েছিল দেশে-বিদেশে কি কি সম্পদ আছে খুঁজে বের করা হবে এবং খোঁজাও হয়েছিল। কি পেয়ে ছিল? কিছুইতো পায়নি। ধানমন্ডি ৩২নং সড়কের বাড়ী (নতুন ১১) জনগণের জন্য আমরা দুই বোন দান করে দিয়েছি- একবার গিয়ে দেখে আসুন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। যিনি জাতির পিতা, যিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন সারাটা জীবন জেলখানায় কাটিয়েছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, মিথ্যা মামলায় হয়রানি হয়েছেন তবুও সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। তার জীবনযাত্রা দেখুন আর এর পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে তাদেরও বাড়ীঘর-সম্পদ হিসাব নিয়ে তুলনা করুন তফাৎটা চোখেই দেখবেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন সকলকে হত্যা করা হয়েছিল তখন তো কোনও দলিলপত্র, কাগজপত্র বা গহনাগাটি কোনও কিছুই তো সরাতে পারেনি, সবইতো সেনাবাহিনীর হাতে ছিল। সবইতো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছিল। তদানীন্তন সরকার দেশে-বিদেশে তদন্ত করে কি পেয়েছিল? কিছুই না, অথচ কত অপপ্রচার, ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই অপপ্রচার বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে। একটি স্বাধীন দেশের ভিত গড়ে তুলতে তিনি তো পরিশ্রম কম করেননি।

১৯৯৬ সালে আমি সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলাম। আমি মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই- তাহল বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আইন আমি করেছিলাম এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করি। আমাদের সরকারের আমলে যে কম দামে বিদ্যুৎ কেনা চুক্তি হয় সেই রকম কম দামে কি আর কেউ বিদ্যুৎ ক্রয় করতে পারবে? এক সেন্ট বাড়ালেই তো ভাল কমিশন পাওয়া যেত কিন্তু দেশের জনগণের অর্থরক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং করেছিও। কিন্তু অর্থ তো লুট করে খেল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার।

আমার বিবেকতো পরিষ্কার যে, কোনও অন্যায় করিনি, অনিয়ম করিনি অন্তত কেউ অর্থ আত্মসাতের কথা বলতে পারবে না। চোর বা চোরের মা তো কেউ বলতে পারবে না। এটাইতো বড় পাওয়া।

তাই আবারও অনুরোধ করব কোনও একটা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢালাওভাবে এক পাল্লায় ফেলবেন না। চোরকে চোর বলেন, সাধুকে সাধু বলেন। সাদাকে সাদা বলেন, কালোকে কালো বলার সৎসাহস দেখান, সেটাই হল বিবেকের কথা। বিবেক জাগ্রত করুন। তাহলে সততারই জয় হবে। মিথ্যার আশ্রয় নিলে মিথ্যাবাদীরাই উৎসাহিত হবে এবং অনিয়ম বাড়বে।

দোষী ও নির্দোষকে এক সঙ্গে দোষারোপ করলে দোষীরাই উৎসাহিত হয়। এখানে ব্যালান্স করার ব্যর্থ প্রয়াস না করাই উত্তম।